নিবেদন

ভক্তিসাহিত্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত অ-দ্বিতীয় গ্রন্থ। ইহার বর্ণিত বিষয় তিন শ্রেণীর—তত্ত্ব, স্তব ও আখ্যান। আখ্যান—কথা ও কাহিনী। কথা—ঘটনার বিবৃতি, কাহিনী—ভক্তচরিত্র কথন। দেশকালের অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনায় এই আখ্যানভাগটিকে বাঙ্গলা গদ্যে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। গ্রন্থের উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। মূলের স্কন্ধ ও অধ্যায় অনুসারে বিষয় সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সময় সময় একাধিক অধ্যায় একসঙ্গে লইয়াছি। ভক্তিমূলক বহু শ্লোক আখ্যানের অংশরূপে সানুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তথাপি অতি-বিস্তারভয়ে ক্ষুব্ধচিত্তে অনেক শ্লোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তত্ত্ব ও স্তব অংশ প্রয়োজনমত অতি যৎকিঞ্চিৎ লইতে পারিয়াছি। শ্রীমদ্‌ভাগবতের স্তবসমূহ সাধনরাজ্যের অমূল্য সম্পদ, ইহার একটি স্বতন্ত্র সঙ্কলন বাঞ্ছনীয়।

'বঙ্গবাসী' ও 'বসুমতী' সংস্করণ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি উভয়ের নিকট ঋণী। শ্লোকের অঙ্ক 'বসুমতী' সংস্করণ হইতে নিয়াছি। অপর সংস্করণের সহিত কোন কোন স্থানে ইহার অতি সামান্য অমিল আছে।

এই গ্রন্থের প্রণয়নকাল কখন ও প্রণেতা কে, তাহা লইয়া সুধীগণ নানা প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং কিছু কিছু গবেষণাও করিয়াছেন। আমি সে সকল কঠিন সমস্যার আলোচনা করিতে সাহস করিলাম না। এই সঙ্কলনকার্য্যে যে সুহৃদ্‌গণ আমাকে উৎসাহ ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া এক্ষণে মূলগ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিব। আমার সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সহৃদয় পাঠকগণের নিকট যুক্তকরে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

গ্রন্থের প্রথম নয় স্কন্ধে প্রধানতঃ শ্রীবিষ্ণুলীলা ও শ্রীকৃষ্ণপূর্ব্ব বিষ্ণুভক্তগণের চরিতকাহিনী, দশমে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা, একাদশে তাঁহার অন্তিমবাণী ও মহাপ্রয়াণ, দ্বাদশে গ্রন্থের কথাভাগের পরিসমাপ্তি। প্রথম নয়ে শান্ত ও দাস্য, দশমে সখ্য বাৎসল্য ও মধুর, একাদশে সকল রসের তাত্ত্বিক সমাবেশ। গ্রন্থের দুইটী বিভাগ সুস্পষ্ট—(ক) ১ হইতে ৯ স্কন্ধ, ও (খ) ১০ হইতে ১২ স্কন্ধ। এই দুই ভাগেই সমগ্র আখ্যানটীর কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিব :—

(ক) ১—৯ স্কঃ —

বিবৃতির ক্রম—স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাকে প্রথমে ভাগবত বলেন। ব্রহ্মা স্বীয় মানসপুত্র নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, বেদব্যাস নিজ পুত্র শুকদেবকে, উহা

শিক্ষা দেন। শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনসভায় ঐ ভাগবত-কথা বিবৃত করেন। রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সূত ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া উহা শোনেন। সূত নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষির যজ্ঞক্ষেত্রে উহা তাঁহাদের নিকট কীর্ত্তন করেন। প্রথম পাঁচটি শ্লোক ছাড়া সমগ্র গ্রন্থ সূত-মুখে ঐ বিবৃতি। তন্মধ্যে দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতে দ্বাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত পরীক্ষিৎ নিকট শুকদেবের ভাগবতকথন। ইহার মধ্যে আবার ৩ স্কঃ ১ অঃ হইতে ৪ অঃ ২৬ শ্লোঃ পর্য্যন্ত অংশ যমুনাতীরে উদ্ধববিদুরসংবাদরূপে, ৩ স্কঃ ৫ অঃ হইতে ৪ স্কঃ শেষ পর্য্যন্ত অংশ গঙ্গাদ্বারে মৈত্রেয়বিদুরসংবাদরূপে এবং ৭ স্কঃ সম্পূর্ণ হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়সভায় নারদযুধিষ্ঠিরসংবাদরূপে, শুকমুখেই কথিত।

কাহিনীগুলির সম্বন্ধ—কাহিনীগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই কোন না কোন সূত্রে পরস্পরসম্বদ্ধ। তৃতীয় স্কন্ধে মৈত্রেয়-বর্ণিত প্রথম মানবমিথুন স্বায়ম্ভুব-মনু ও শতরূপা হইতে তৎপরবর্ত্তী এই ৯ স্কন্ধের প্রায় সমস্ত বৃত্তান্তেরই সূত্রপাত। ঐ তৃতীয় স্কন্ধে দেবহূতি কপিল, চতুর্থে সতী ধ্রুব, পঞ্চমে ঋষভ ভরত, ষষ্ঠে দ্বিতীয় দক্ষ ত্বষ্টা বিশ্বরূপ বৃত্র, সপ্তমে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ, ঐ মনু-শতরূপারই পুত্র বা কন্যার বংশ। অষ্টমে চতুর্থ মনু তামসের, পঞ্চম মনু রৈবতের ও সপ্তম মনু বৈবস্বতের সময়ের ঘটনা। নবমের অম্বরীষ খট্বাঙ্গ ঐ সপ্তম মনু বৈবস্বতের বংশীয়। এই সমস্ত মনুই প্রথম বা স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর। বৈবস্বত মনুর নাম হইতে তাহার বংশধরগণ 'সূর্য্য' বংশ। মনুদের নাম, কার্য্য ও কার্য্যকালের পরিচয় ৮ স্কঃ ১৩-১৪ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (২য় সং, ১১৬ পৃঃ)। নবমের পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে ঐ স্কন্ধের শেষ পর্য্যন্ত 'চন্দ্র' বংশীয় ভক্ত রাজগণের বৃত্তান্ত। ইহাদের আদিপুরুষ ব্রহ্মার মানসজাত পুত্র অত্রি, তৎপুত্র সোম, অর্থাৎ চন্দ্র। সোমবংশীয় নহুষপুত্র যযাতি, তৎপুত্র যদু হইতে যদুবংশ; অপর এক পুত্র পুরু, তদ্‌বংশীয় কুরু হইতে কুরু পাণ্ডব। চন্দ্রবংশে কোন মনু নাই। এই সকল স্কন্ধে বর্ণিত ১৬ জন প্রধান ভক্তের মধ্যে ১০ জন সূর্য্য ও চন্দ্র বংশীয়, ৪ জন অসুর ও গন্ধর্ব্ব, ১ জন অজামিল কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ ও একজন মুনিশাপে গজজন্মপ্রাপ্ত বিখ্যাত রাজা।

শ্রীনারদ—এই সকল ভক্তচরিতকাহিনীতে শ্রীবিষ্ণু ও ব্রহ্মার পর শ্রীনারদের অবদানই প্রধান। শ্রীনারদ শ্রীভাগবতকথিত ভক্তিধর্ম্মের ধারক, বাহক ও প্রচারক। তাঁহার তিনটি জন্মের পরিচয় পাই। প্রথম, উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব, দ্বিতীয়, ঋষি-আশ্রমে দাসীপুত্র, শেষ, স্বয়ং ব্রহ্মার মানসপুত্র। গন্ধর্ব্ব-জন্মে দুরাচরণের ফলে দ্বিতীয় জন্ম, দ্বিতীয় জন্মের সাধনবলে শেষ জন্ম।

দ্বিতীয় জীবনের বর্ণনায় সাধনের যে তত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সকল যুগের সকল সম্প্রদায়ের ভক্তিসাধককে এক নিশ্চিত পন্থার সন্ধান দেয়—'সকৃদ্‌ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।' শেষ জন্মে, মনুসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান পর্য্যন্ত নারদের বহুযুগব্যাপী কর্ম্মজীবন লিপিবদ্ধ। পিতা ব্রহ্মার দ্বারাই তিনি ভক্তিধর্ম্মে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইলেন, দেবদত্ত বীণার ঝঙ্কারে হরিগুণ গাইয়া আকাশ, ভূমি ও 'সুতল' মাতাইয়া তুলিলেন। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীকুঞ্জে, মথুরার কংস-পুরীতে, দ্বারকার মহিষীভবনে, বনে পর্ব্বতে, জলে স্থলে, তাঁহার অব্যাহত গতি। দেব গন্ধর্ব্ব অসুর মানব—যেখানে যখন যে সমস্যা উঠিয়াছে, শ্রীনারদ তাহার সমাধান করিয়াছেন এবং ঘটনার স্রোতকে নিয়ত নিষ্কাম ঐকান্তিক ভক্তির মুখে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। কালের ক্রম হিসাবে এই নয় স্কন্ধে নারদের প্রথম আবির্ভাব কর্দ্দম-দেবহূতির বিবাহপ্রস্তাবে, দ্বিতীয় শিবকে সতীর দেহত্যাগ-সংবাদদানে, তৃতীয় গভীর অরণ্যগর্ভে শ্রীহরির অন্বেষণ-নিরত বালক ধ্রুবের সন্নিধানে। আখ্যানভাগে প্রথম দুইটি ঘটনার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, কিন্তু শেষটি এই গ্রন্থের এই অংশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম ভক্তের জীবননিয়ন্ত্রণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। ধ্রুবকে তিনি প্রথমে পরীক্ষা করিলেন, পরে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন, হরিসাধনের স্থান ও উপায় বলিয়া দিলেন, ধ্রুব মধুপুরীতে গিয়া হরিলাভ করিলেন। এদিকে, অনুতপ্ত পিতা পাছে শিশুকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, সেজন্য পিতার নিকট আসিয়া পুত্রের কুশলসংবাদদানে তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া রাখিলেন। তারপর, শ্রীনারদকে দেখি রাজা বর্হিষৎ বা প্রাচীনবর্হির রাজসভায়। প্রাচীনবর্হি রাজর্ষিকুলতিলক পৃথুর সুযোগ্য বংশধর। কিন্তু তিনি বহুকুশাস্তীর্ণ যজ্ঞভূমিতে বহু পশু হত্যা করিতেছেন। দেবর্ষি আসিয়া নির্ভীককণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন, রাজন্‌, এই তীক্ষ্ণ কুশাগ্র ও বহু পশুহত্যাপূর্ণ কাম্যকর্ম্মের দ্বারা তোমার কোন্‌ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে? ঐ দেখ, তোমার নিহত ক্রুদ্ধ পশুগণ তোমার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে, লৌহময় শৃঙ্গ দ্বারা তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিবে। রাজা ভীত হইয়া জ্ঞান যাচ্ঞা করিলেন, নারদ প্রসিদ্ধ পুরঞ্জনের আখ্যান ব্যাখ্যা করিলেন, রাজা পুত্রগণের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া তপস্কাম হইয়া কপিলাশ্রমে চলিয়া গেলেন। এইরূপে এই অকিঞ্চন অনিকেত ভক্তরাজ বর্হিষতের রাজসভার কুট্টিমতলে ভক্তিহীন কাম্যপূজার বিরুদ্ধে শুদ্ধ নিষ্কামভক্তির জয়স্তম্ভ সুদৃঢ়রূপে নিখাত করিলেন।

তারপর শ্রীনারদ প্রচেতা নামক প্রাচীনবর্হির অনুতপ্ত পুত্রগণকেও ঐ উপদেশ দিলেন। সিন্ধুনদের সাগরসঙ্গমে পুত্রকাম দ্বিতীয় দক্ষের পুত্র দ্বিতীয়

প্রচেতাগণের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'এ যে সকাম তপস্যা, ইহা অসৎ কর্ম্ম'—তাহারা নিবৃত্ত হইল। পুনঃ, দ্বিতীয় দক্ষের অপর পুত্রগণকেও ঐরূপে নিবৃত্ত করিলেন। দ্বিতীয় দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, 'ত্রিভুবনে তুমি কোথাও বাসভূমি পাইবে না।' নারদ ঐ অভিশাপ মাথায় তুলিয়া লইলেন। —পুত্রশোকাতুর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রকেতুর মৃত পুত্রকে মন্ত্রবলে উজ্জীবিত করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই পুনর্জীবন অঙ্গীকার করিল না। নারদের এই শিক্ষায় গন্ধর্ব্বরাজ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন।

প্রহ্লাদ অনিমিত্তা ভক্তির অতুলনীয় প্রতীক। আকাশপথে দেবরাজ ইন্দ্রের কবল হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীনারদ যখন তাহার জননীকে নিজ আশ্রমে নিয়া গেলেন, প্রহ্লাদ তখন সেই মায়ের গর্ভে। নারদের বরে মন্দারপর্ব্বতে ধ্যাননিরত পিতার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বহুকাল তিনি মাতৃজঠরেই রহিলেন। শ্রীনারদ প্রতিদিন গর্ভমধ্যেই তাঁহাকে ভক্তি শিক্ষা দিতে লাগিলেন, গর্ভমধ্যেই পরমাভক্তি লাভ করিয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেন। শ্রীনারদের উপদিষ্ট ভক্তিযোগই প্রহ্লাদ গুরুগৃহে বয়স্যগণকে শিক্ষা দেন। বহুযুগ পরে শ্রীনারদই যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় প্রহ্লাদচরিত বিবৃত করেন। যতি, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে নারদ যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ দেন, তাহাতে তিনি আধুনিক সমাজ-তান্ত্রিক সাম্যবাদের মূল তত্ত্বটী কি দৃঢ়ভাবে ঘোষিত করিলেন—

যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥ ৭।১৪।৮

ইন্দ্র-বলি যুদ্ধে দৈত্যধ্বংস-বারণ প্রথম নয় স্কন্ধে নারদের শেষ কার্য্য।

সর্ব্বশেষ, সরস্বতীতীরে ক্ষুব্ধচিত্তে উপবিষ্ট লোকগুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন। বেদের বিভাগ করিয়াছেন, বেদান্তের সূত্র লিখিয়াছেন, পঞ্চমবেদ মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাপি চিত্ত অ-শান্ত। শ্রীনারদ আসিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, তোমার ব্রহ্মসূত্র যুক্তিবাদী, মহাভারত কাম্যকর্ম্মবাদী। শ্রীহরির লীলা ও গুণ কথন ব্যতীত আর সকল কথাই 'বাতাহত নৌরিব' বুদ্ধিকে সতত চঞ্চল করে। তখনই সেই পরম ঋষি স্থির আস্পদের সন্ধান পাইলেন, শম্যাপ্রাসের পুণ্য আশ্রম হইতে এই মহাগ্রন্থের উদ্ভব হইল।

(খ) ১০—১২ স্কঃ —

দশম স্কন্ধ শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু-প্রচারিত ভক্তিধর্ম্মের মেরুদণ্ড। তত্ত্বে, ভাবে ও কবিত্বে ইহা অতুলনীয়। বাঙ্গলার বহুকাব্য এবং প্রায় সমগ্র ভক্তিসাহিত্য ইহার প্রভাবে সমৃদ্ধ। নানা সাধক, নানা টীকাকার, নানা লেখক, নানা

'পাঠক' বা 'কথক' ইহার ভাবধারাকে নিত্য নব নব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন। ভাব ও কল্পনারাজ্যের ইহা অক্ষয় ভাণ্ডার। ভারতের বহুস্থানে, বিশেষ বাঙ্গলায়, ভক্তির ধারা আজও এই দশমের খাতে প্রবাহিত। শ্রীরামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি বাঙ্গলার মহাপুরুষগণ শক্তিসাধনার সহিত ইহার অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রথম চল্লিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের গোকুলবৃন্দাবন-লীলা, তার পর দশ অধ্যায় তাঁর মথুরালীলা ও অবশিষ্ট চল্লিশ অধ্যায় দ্বারকা-কুরুক্ষেত্র লীলা। একাদশ, প্রভাসতীর্থে স্বকুলনাশ ও মহাপ্রয়াণ। দ্বাদশ স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে, শুকদেবের কথা সমাপ্তি ও প্রস্থানের পর ১০ হইতে ২৮ এই কয়টীমাত্র শ্লোকে পরীক্ষিতের দেহত্যাগ এবং তৎপুত্র জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ ও যজ্ঞশেষ। এই স্কন্ধের ৯ ও ১০ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের ভগবন্মায়াদর্শন জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশের একটী অপূর্ব্ব চিত্র। অবশিষ্ট, বেদের শাখা কলিধর্ম্মাদি ও রাজবংশ কথন এবং গ্রন্থ-সমাপ্তি।

শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা—এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের মহালীলার পুণ্যকাহিনী যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইব।—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় বসুদেব-দেবকীর কারাগৃহে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পক্ষণ পরই কংসভয়ে পিতা কর্ত্তৃক যমুনার অপরপারে বৃহদ্বন বা মহাবন গোকুলে নীত হন। তাঁহার অতি শৈশবকালেই মহাবনে নানা উৎপাত দেখা দেয়। পূতনা রাক্ষসী ও তৃণাবর্ত্ত অসুর বধের পর পদাঘাতে একটি বৃহৎ শকট ও উদূখল-আঘাতে দুইটি যুক্ত অর্জ্জুনবৃক্ষ ভঙ্গ তাঁহার এই সময়ের কীর্ত্তি। মথুরা হইতে বসুদেবপ্রেরিত গর্গ আসিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন। শিশু যেমন বাড়িতে লাগিলেন, নানা বালচাপল্যও তেমন বাড়িতে লাগিল। প্রায়ই প্রতিবেশীর গৃহে লুঠিয়া বা চুরি করিয়া বয়স্য ও বানরগণকে ননী-মাখন খাওয়াইতেন, কিছু বা আপনি খাইতেন। এদিকে মহাবনে মহোৎপাতসকলও কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। তখন গোপপ্রধানগণ যমুনা পার হইয়া তৃণবহুল নদীপর্ব্বতসেবিত বৃন্দাবনভূমিতে বাস উঠাইয়া নিলেন। ক্রমে বয়স্যগণসহ গোচারণ আরম্ভ হইল। এখানেও গোবৎস ও বকরূপে দুই অসুরকে নিহত করিয়া তিনি গো ও গোপবালকগণকে রক্ষা করেন। তার পর একদিন স্বয়ং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোধন ও গোপ-বালক অপহরণ, তিনি দৈব-শক্তিবলে ব্যর্থ করিয়া দিলেন।—জলেও উৎপাত নামিল। কালিয় নামে এক মহাবিষধর বহুফণ ভুজঙ্গ সবংশে আসিয়া যমুনার জল এমন দূষিত করিয়া তুলিল যে একদিন গোপবালকগণ সেই বিষাক্ত জল পান করিয়া তৎক্ষণাৎ গতাসু হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেই হ্রদে নামিয়া অসামান্য শক্তিবলে কালিয়কে মৃতপ্রায় এবং অনুচরসহ রমণক

দ্বীপে তাড়িত করিয়া যমুনাকে বিষমুক্তা করিলেন। অগ্নিদেবও ছাড়িলেন না, দুইবার শ্রীকৃষ্ণ ভীষণ দাবানল হইতে গো ও গোপবালকগণকে রক্ষা করিলেন।

কিন্তু অসুর রাক্ষস সর্প অনল কিছুই সেই বালকের বয়স্যসহ গোচারণ বা ক্রীড়ামোদ ব্যাহত করিতে পারিল না। তিনি ক্রীড়াকালে সময় সময় অগ্রজ বলরামের ব্যজন এবং পাদসংবাহনও করিয়া দিতেন। ক্রমে গোপবালিকা এবং গোপবধূগণও তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া উঠিল। ময়ুর-পাখার চূড়া, কর্ণিকার ফুলের দুল ও পাঁচফলের মালা পরিয়া সকলসুন্দর-সন্নিবেশ সেই পীতবাস অধরে বাঁশী ধরিয়া বাজাইতে বাজাইতে গোধূলিরঞ্জিত চূর্ণকুন্তল ও নূপুরভূষিত চরণকমল লইয়া যখন গৃহে ফিরিতেন, রমণীগণ তখন পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই বীরশিশুর প্রদীপ্ত রূপরাশি অনিমেষনয়নে পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। ব্রজকুমারীরা তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করার জন্য সকলে মিলিয়া কাত্যায়নীব্রত আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কেহ কাহাকে দ্বেষ করিলেন না। ক্রমে সেই বালকও রমণীগণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন ক্রীড়াচ্ছলে যমুনায় ব্রতস্নানরতা বিবস্ত্রা বালিকাগণের তীরত্যক্ত বসনসমূহ লইয়া তীরস্থ এক কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। রমণীগণ সকল ভয় সকল লজ্জা ত্যাগ করিয়া তদেকমাত্রচিত্তে তীরে উঠিয়া যুক্তকরে বস্ত্র চাহিয়া লইলেন। বালক মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে এক রজনীতে ক্রীড়া করিবেন, এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন। তার পর, ব্রজের ব্রাহ্মণরমণীগণও একদিন যজ্ঞশালা হইতে প্রভূত সুস্বাদু খাদ্য আনিয়া তাঁহার প্রতি যে গভীর স্নেহের পরিচয় দিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাদের বেদবাদী পতিগণও শ্রীকৃষ্ণকে আত্মদান করিলেন। এইরূপে সমগ্র ব্রজভূমির মানুষ ও পশু হৃদয় জিত হইল।

দেবতাদের জয় এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ত জিত হইয়াছেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রই বা কোন্ অধিকারে 'ইন্দ্রযাগের' পূজা পাইবেন? তিনি মেঘাধিপতি, কিন্তু মেঘসকল ত ঐশ্বরিক নিয়মেই বারিবর্ষণ করিবে। গো নদী ও পর্ব্বতই গোপকুলের পূজার্হ, নিম্নজাতি ও গৃহপালিত পশুগণই অন্নদানের যোগ্য, শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশে ইন্দ্রযাগজন্য আহৃত উপচারসমূহ যখন গো, গোবর্দ্ধন, বৃক্ষ, অন্ত্যজ ও পশুগণের সেবায় ব্যয়িত হইল, দেবরাজ তখন মহাকোপে প্রবলবাত্যা ও বারিবর্ষণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনের 'ছত্রাক'-তলে ব্রজের সমস্ত নরনারী গো ও সম্পদসমূহ রক্ষা করিলেন। ইন্দ্র আসিয়া শরণাগতি জানাইলেন, গোমাতা সুরভি আসিয়া সেই দেবশিশুকে 'গোবিন্দ' বা 'গো-গণের ইন্দ্র' এই আখ্যা দিলেন, দেবরাজ স্বয়ং এই অভিষেক সম্পন্ন করিলেন। এই রূপে এই 'গূঢ়লিঙ্গ'

মানবশিশু সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপনের ব্রতে স্বয়ং-দীক্ষিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স সাত বছর।

'ইন্দ্রযাগ' উঠিয়া গেল। ব্রজভূমে যে মহা প্রেমযাগের সুরু হইয়াছিল, বস্ত্রহরণকালে প্রতিশ্রুত ক্রীড়া 'রাসক্রীড়া'রূপে এক্ষণে সেই প্রেমযজ্ঞে পূর্ণাহুতি লাভ করিল। ক্রীড়ার পূর্ব্বে প্রেমের পরীক্ষা, আরম্ভে গর্ব্বনাশ। প্রেমের মাদকতায় প্রেমিকাকে বিভ্রান্ত হইতে দিলেন না। যেই গর্ব্ব উপস্থিত, অমনি 'প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।' তারপর প্রেমের দুর্দ্দমনীয় আহ্বান, রাসচক্রে আবির্ভাব, এবং সর্ব্বশেষে, সেই যোগেশ্বরের প্রতি-ইন্দ্রিয়ের সহিত গোপীর অন্তর্বহিঃ প্রতি-ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ মিলন।

কিন্তু আবার সেই উৎপাত। এক মহাসর্প আসিয়া নন্দকে গ্রাস করিল। অরিষ্ট কেশী ও ব্যোম ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া আবার গো গোপালকগণকে আক্রমণ করিল। কৃষ্ণহস্তে সকলেই সমুচিত গতি লাভ করিল।

এদিকে নারদের মুখে স্বীয় ভাবী প্রাণহন্তা কৃষ্ণ-বলরামের সংবাদ পাইয়া দুর্ব্বুদ্ধি কংস এক কপট ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করিয়া তাঁহাদের নিধনের সঙ্কল্প করিল। অক্রূর তাঁহাদিগকে ও নন্দকে আনিতে ব্রজে প্রেরিত হইলেন। অক্রূর আসিয়া সকল কথাই জানাইলেন, নন্দ বা সেই নির্ভীক বালকদ্বয় বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া পরদিন প্রত্যুষেই অক্রূরসঙ্গে মথুরা যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অদম্য সাহসে ধর্ম্মসংস্থাপনের কঠোর কর্ত্তব্যের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ক্রীড়াকৌতুক, আমোদপ্রমোদ, তদ্গতা গোপললনাগণের হৃদয়বিদারক প্রেমার্ত্তিতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। অনাসক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ এইখানেই 'ব্রজের খেলা' শেষ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স এগারো বছর।

মথুরায় আসিয়া সুকঠিন কর্ত্তব্যের দায়ে প্রণয়াবনত অক্রূরের আতিথ্যও গ্রহণ করিলেন না, শম ও দম দুই উপায়েই প্রয়োজনীয় বস্ত্র মাল্য অনুলেপনাদি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। ধনুর্যজ্ঞশালায় আসিয়া রক্ষীগণকে অক্লেশে নিহত করিয়া ধনুর্ভঙ্গ করিলেন। প্রত্যুষে মল্লক্রীড়ার মহোৎসব আরম্ভ হইল। রঙ্গদ্বারে কুবলয়াপীড় ও তাহার মাহুতকে চূর্ণ করিলেন, রঙ্গক্ষেত্রে রাজা ও সমবেত দর্শকগণের সমক্ষে দুই ভাই চাণূর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়কে নিহত করিলেন। কুক্ষণে হতভাগা কংস আদেশ করিল, 'ইহাদিগকে পুরী হইতে তাড়াইয়া দেও, নন্দকে বান্ধ, আমার পিতা উগ্রসেনকে বধ কর।' তখনই শ্রীকৃষ্ণ ঐ দুর্ম্মতির দেহ উচ্চ রাজমঞ্চ হইতে সবলে ভূমিতলে লুণ্ঠিত করিয়া তাহার শেষ গতির বিধান করিলেন। সমবেত জনতার সম্মতিক্রমে উগ্রসেন

স্বরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত হইলেন, ক্রমে কংসভয়ে পলায়িত যাদবগণ মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। শূরসেনের মথুরার প্রাচীন রাজ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইল। বিধিমত সকল সংস্কার ও তারপর উজ্জয়িনীতে সান্দীপনির নিকট শিক্ষালাভও সম্পন্ন হইল। বৃন্দাবনে সকল সংবাদ দিতে উদ্ধবকে ও ইন্দ্রপ্রস্থের সংবাদ নিতে অক্রূরকে পাঠাইলেন। উদ্ধব ফিরিয়া আসিয়া গোপীদিগের প্রণয়বার্ত্তা এবং অক্রূর হস্তিনা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান দিলেন।

মথুরা তখন মহা বিপন্ন। কংসের শ্বশুর মহাবল জরাসন্ধ আঠারো বার আসিয়া নগর আক্রমণ ও অবরোধ করিল, তদুপরি আবার কালযবন। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে সকল আক্রমণই ব্যর্থ হইল, কিন্তু যদুকুলের মথুরাবাস নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুদূর রৈবতকের গিরিদুর্গমালার আশ্রয়ে সমুদ্রকূলে বা দ্বীপে এক নগর নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে তথায় লইয়া গেলেন।

দ্বারকা সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল, শ্রীকৃষ্ণ রাজা না হইয়াও 'দ্বারকানাথ' হইলেন। এইবারে তাঁহার গার্হস্থ্যলীলা। নানা যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা বহুস্ত্রী লাভ করিলেন, তন্মধ্যে দুরন্ত নরকাসুরকে বধ করিয়া তাহার কবল হইতে মুক্তা বহু রাজকন্যা। কিন্তু প্রধানা মহিষী রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি আট জন। পুত্রগণমধ্যে প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব এবং পৌত্রগণমধ্যে অনিরুদ্ধের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। প্রদ্যুম্ন সম্বরাসুর দ্বারা অপহৃত হইয়া ঐ অসুরের পাচকার সাহায্যেই তাহাকে বধ করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সাম্ব হস্তিনায় রাজা দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিয়া কুরুপতিগণ দ্বারা অবরুদ্ধ হন, বলরাম হস্তিনাকে হল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জনের ভয় দেখাইয়া সাম্বকে লক্ষ্মণাসহ মুক্ত করেন। এই সাম্বই শেষে গর্ভিণীবেশে যদুকুলনাশন মুষল প্রসব করেন। অনিরুদ্ধ শোণিতপুররাজ বলিপুত্র বাণের কন্যা উষার প্রণয়াবদ্ধ হইয়া বাণপুরীতেই ধৃত ও আবদ্ধ হন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সসৈন্যে সেখানে গিয়া বধূসহ তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন। এই সকল পারিবারিক অশান্তি ছাড়া জ্ঞাতিদ্রোহও তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বিব্রত করিয়াছিল। স্যমন্তক-উদ্ধারের ঘটনাগুলি একটী উদাহরণ মাত্র।—দশম স্কন্ধের ৬০ অধ্যায়ে দাম্পত্য জীবনের, ৭০ অধ্যায়ে গার্হস্থ্যজীবনের, ৭১ অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের এবং ৮০ হইতে ৮৬ অধ্যায়ে ব্যক্তিগত জীবনের—এইরূপ পর পর কয়েকটী চিত্রে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র মানুষচরিত্রের একটী পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্য, ভগবৎপূজা, উপযুক্ত

পাত্রে অকাতরে দান, রাজগণের রক্ষা-বিধান, বন্ধু-প্রীতি, সকল জীবের প্রতি অকৃত্রিম সৌহৃদ্য, পিতৃমাতৃভক্তি, ইত্যাদির কয়েকটী উজ্জ্বল আলেখ্য ঐ সকল অধ্যায়ে অঙ্কিত হইয়াছে। ৮৯ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎপূজা এবং অংশাবতারের উল্লেখ পাওয়া যায়। জীর্ণবসন কপর্দ্দকবিহীন 'ব্রহ্মবন্ধু'র পা-ধোওয়া জল মাথায় ধারণ করা এবং তাঁহাকে শয়নমন্দিরে নিজ পর্য্যঙ্কে বসাইয়া প্রধানামহিষী-হস্তে তাঁহার ব্যজন—'নিখিলরাজন্যজয়ী' দ্বারকাধীশের একান্ত নিরভিমান সেবাধর্ম্মের চূড়ান্ত উদাহরণ।

দ্বারকায় বহিঃশত্রুরও অভাব ছিল না। পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও তাহার সখা কাশীরাজকে নিহত করিতে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে অভিযান করিতে হয়, কিন্তু শাল্ব দন্তবক্র ও বিদূরথ ক্রমে সসৈন্যে আসিয়া পুরী আক্রমণ করিল। শাল্ব-যুদ্ধে প্রদ্যুম্ন একবার হটিয়া গেলেন, ইন্দ্রপ্রস্থে সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া শাল্বের মায়াপুরী বিধ্বস্ত ও তাহাকে সকল মায়া হইতে মুক্ত করেন। দন্তবক্র ও বিদূরথ সহজেই নিহত হইল।

রাজসূয়ে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন। একটী নিরপরাধ প্রাণীরও বিন্দুমাত্র রক্তপাত না করিয়া সুকৌশলে অমিতবলদৃপ্ত জরাসন্ধের বধ সাধন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করিয়া বহু উপঢৌকন সহ স্ব স্ব রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। এখানেও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইল। রাজসূয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে অগ্রপূজা পাইলেন, ক্রুদ্ধ ও আক্রমণোদ্যত শিশুপালকে স্বহস্তে নিহত করিলেন, রাজসূয় শেষ হইল। এই মহোৎসবে দুর্য্যোধন স্বগণ-সহ খুব খাটিলেন, কিন্তু কুক্ষণে একদিন রাজসূয়ে সংগৃহীত যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরের বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্ভারের প্রতি সহসা তার চোখ পড়িল, আর ময়দানবের নির্ম্মিত মায়াসভায় জলভ্রমে স্থলে ও স্থলভ্রমে জলে পড়িয়া সে পাণ্ডুপুত্রগণের বড়ই বিদ্রূপভাজন হইল। দুর্য্যোধনের এই ঈর্ষা ও অপমানের ফলেই শকুনির অক্ষক্রীড়া, দ্রৌপদীর অভিমর্ষণ, পাণ্ডবের সর্ব্বস্বহরণ এবং তেরো বছর অজ্ঞাতবাস। ইহারই শেষ পরিণতি কুরুক্ষেত্রের মহাসমর, কুরুক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে কুরুপাণ্ডবপক্ষীয়দের মহা সমাধি। এই মহা সমাধির উপর শ্রীকৃষ্ণ শরশয্যাশায়ী মহামতি ভীষ্মের উপদেশমত যুধিষ্ঠিরাদির দ্বারা হস্তিনায় উত্তরভারতের এক সুপ্রতিষ্ঠ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া তাঁহার মানুষ-জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রতের উদ্‌যাপন করিলেন—'অঞ্জসা বর্ত্তয়ামাস ধর্ম্মং ধর্ম্মসুতাদিভিঃ' (১০।৮৯।৬৫)।

শ্রীভাগবতকার এই পবিত্র সমাধির উপরই এই গ্রন্থরূপ মহাসৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যুদ্ধান্তে দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চপুত্র হত্যা, তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের

উপদেশে অশ্বত্থামার শিরোমণি কর্ত্তন, অশ্বত্থামার আগ্নেয়াস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উত্তরার গর্ভরক্ষা—এই তিনটি বৃত্তান্তের উপরই এই গ্রন্থের আখ্যানভাগের পত্তন। ইহার পর যুধিষ্ঠিরের তিনটি অশ্বমেধ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় আসিয়াছিলেন, তারপর আর আসেন নাই। দ্বারকার রাজ্যসন্নিবেশে এবং অবশেষে নিজ দুরন্তবংশের ধ্বংস-সাধন-কার্য্যে তাঁহার অবশিষ্ট মনুষ্য জীবন পরিসমাপ্ত হইল।

এখন এই শেষের কথা বলিব। শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বৎসর নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দুর্দ্ধর্ষ যাদবকুলকে আর রক্ষা করা গেল না। তিনি নিজেই উহার ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সুধর্ম্মাসভায় সমবেত যাদবগণকে বলিয়া কহিয়া ও ভয় দেখাইয়া দ্বারকা হইতে প্রভাসে নিয়া গেলেন। মৈরেয়পানে আত্মকলহে বিধ্বস্ত হইয়া যখন সকল অস্ত্র নিঃশেষ হইল, তখন ঋষিশাপোদ্ভূত মুষলের চূর্ণ হইতে সমুদ্রের উপকূলে যে এরকাতৃণের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা দ্বারাই যদুকুলের ধ্বংস সাধিত হইল।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের চিরসখা ও রহঃসচিব। একটি 'অর্ভক' অশ্বত্থের মূলে অন্তিম আসনে সমাহিত এই মহাযোগেশ্বর মহামানবের পাদমূলে শ্রীউদ্ধব আসিয়া লুঠিয়া পড়িলেন। ভক্তির নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া এবং "সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্" এই মহাবাক্য দ্বারা উদ্ধবকে শান্ত করিয়া লোকসংগ্রহের জন্য তিনি তাঁহাকে এ লোকে রাখিয়া গেলেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের চিরসাথী সারথি দারুক তাঁহার দিব্য যান ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেই তরুণ তরুতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রথ ও অস্ত্রশস্ত্র সমুদয় বিদায় দিলেন, 'উপশমং ব্রজ' বলিয়া দ্বারকায় দারুকের অবশিষ্ট কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া মুষলের চূর্ণাবশিষ্ট লৌহখণ্ড-গ্রথিত শরদ্বারা যে ব্যাধ তাঁহার সুদীপ্ত চরণতল আহত করিয়াছিল, তাহাকে আশ্বস্তি দিয়া ও সদ্গতি প্রাপ্ত করাইয়া সেই ভূমা পুরুষ নিজ মানুষী তনু সহসা অন্তর্হিত করিলেন।

বলদেব শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই মহাসমাধিতে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। দারুকমুখে সকল সংবাদ পাইয়া বসুদেব দেবকী মহিষীগণ সহ নিজ নিজ দেহ রক্ষা করিলেন। অর্জ্জুন যদুকুলের ধ্বংসাবশেষ লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে এই সর্ব্বনাশকর সংবাদ জানাইলেন। পরীক্ষিৎকে হস্তিনায় ও বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষিক্ত করিয়া পাণ্ডবভ্রাতাগণ মহাপ্রস্থানের পথে কর্ম্মলীলা শেষ করিলেন। কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা নিজ নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন। কুরু-পাণ্ডবের রঙ্গমঞ্চে শেষ যবনিকার পতন হইল।

গোকুল ও বৃন্দাবনের বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, মথুরায় শূরসেনের প্রাচীন রাজধানীতে তাঁহার মধ্যলীলা এবং দ্বারকায় হস্তিনাপুরে কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসে তাঁহার অন্ত্যলীলা অভিনীত হইল। তিন লীলাই কর্ত্তব্যের লীলা, প্রেমের লীলা, আকারের ভেদ মাত্র। ভারতের ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি—সকল ক্ষেত্রে 'আচারে ও প্রচারে' এক শাশ্বত আদর্শ সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রয়া এই যোগযোগেশ্বর এই মহা ভারতের পশ্চিম সাগরের মহাতীর্থে তাঁহার কর্ম্মময় মহালীলা সম্বরণ করিলেন।—সাত দিনে কুশস্থলা সাগরপ্লাবিতা হইল।—ওঁ—

শ্রীভাগবতের ভক্তিবাদ—

আমাদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র প্রায় সকলই জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি এই তিনটি সূত্র অবলম্বনে ব্যাখ্যাত। এই তিনের মূল বেদে, সুতরাং বেদই সকল শাস্ত্রের 'একায়ন'। বেদান্ত বা উপনিষদের বৈশিষ্ট্য জ্ঞান বা তত্ত্বে, গীতার বৈশিষ্ট্য কর্ম্মে, ভাগবতের বৈশিষ্ট্য ভক্তিতে। তন্ত্র বা শৈব শাক্ত ধর্ম্ম, ভক্তি-প্রধান। উপনিষদের পরম ঋষিগণ ভক্তির মূল উপাদানসমূহ সকলই সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। গীতাকার তাহা লইয়া জ্ঞান ও কর্ম্মমিশ্রণে ভক্তির একটি কাঠামো প্রস্তুত ক'রয়াছেন, ভাগবতকার তাহাতে ভক্তিদেবীর একটী পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধমুখে গীতা, যুদ্ধশেষে ভাগবত। ভক্তিবাদে গীতা যেখানে শেষ, ভাগবত সেখানে আরম্ভ। 'সত্যং পরং ধীমহি' দ্বারা এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ। 'প্রোজ ঝিত-কৈতব' (১।১।২) বা অকপট ভক্তিধর্ম্মের প্রচার ইহার উদ্দেশ্য। এই ভক্তিসাধনের তত্ত্ব ও প্রণালী উভয়ই 'নিগমমূলক' (১।১।১-৩)। নিগম বা শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' (বৃহ ২।৫।১৯); তিনি 'দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য' (বৃহ ২।৪।৫) ; তিনি রসরূপে, আনন্দরূপে, সুখরূপে, অমৃতরূপে 'মন্তব্য ও উপাসিতব্য' ; তাঁহার দ্বারা 'সম্পরিষ্বক্ত' হইলে (বৃহ ৪।৩।২১-২২) চণ্ডাল অ-চণ্ডাল, পুক্কশ অ-পুক্কশ, শ্রমণ অ-শ্রমণ হইয়া যায়। এই খানেই অনিমিত্তা প্রেমভক্তির মূল। শ্রীভাগবত ভগবল্লীলা ও ভক্ত-চরিত বর্ণনা দ্বারা নানাভাবে সেই 'অরূপ অথচ উরুরূপ'-এর (৮।৩।৯) প্রতি এই অনিমিত্তা ভক্তির পরিপূর্ণ মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন।

ঈশ্বরারাধনা কোন হেতুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা মানুষের স্বাভাবিকী বৃত্তি বা ধর্ম্ম। ইহা বহু 'আয়াসসাধ্য' নহে (৭।৬।১৯ ; ৭।৭।৩৮), বহু শাস্ত্রপাঠ, বহু ক্রিয়ানুষ্ঠান বা কোন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। 'মন্ত্রলিঙ্গ-ব্যবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ণকুশাগ্রবহুল' (৪।২৯।৪৫-৪৯) সকাম ক্রিয়া 'বিষমবুদ্ধি-বিরচিত' (৬।১৬।৪১)।

অর্চ্চা বা প্রতিমায় পূজা যতক্ষণ সর্ব্বভূতে শ্রীহরিকে দেখিবার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল একটা বিশিষ্ট গণ্ডীতে দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, ততক্ষণ সাধক 'ভস্মন্যেব জুহোতি' (৩।২৯।২২)। সমদৃষ্টিই সেই পরম দেবের মহৎ সমর্হণ বা পূজা (৭।৮।৯)। 'ঔৎকণ্ঠ্য' বা অখণ্ড আগ্রহ দ্বারাই শ্রীহরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন, তখন ভক্ত তাঁহার সহিত সততযুক্ততা লাভ করেন, তখন বাক্যমনের 'মৃষাগতি' ও অন্তর্ব্বহিঃ ইন্দ্রিয়দামের অসৎপথে প্রবৃত্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হয় (২।৬।৩৪)। এই আগ্রহ 'তপোযুক্ত ভক্তিযোগ' দ্বারা লভ্য। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ও 'নিষ্কিঞ্চনের পাদরজঃ' (৭।৫।৩২) এই তপস্যার প্রধান সহায়। এই পথেই শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তির 'অনুক্রমণ' বা ক্রমাভিব্যক্তি (৩।২৫।২৫)। ভক্তিলব্ধ সুখ ও আনন্দ যেমন বাড়ে, জীবের দুঃখতাপবোধ তেমনই কমে, চিত্তবৃত্তি তেমনই শান্ত 'অমৎসর' ও রাগদ্বেষশূন্য হইয়া ওঠে। চিত্তশুদ্ধি ভক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে, যেমন অন্নের প্রতি গ্রাসে জীবের 'ক্ষুদপায়, তুষ্টি ও পুষ্টি' হইতে থাকে (১১।২।৪২)। দেহে অনাত্মবোধ এবং ভোগে অ-রাগ বা অনাসক্তি এই পরম তত্ত্ব অভ্যাসের ক্রমশঃ অর্জ্জিত ও প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল পরিণতি। দেহ একদিকে যেমন 'শ্ব-শৃগাল ভক্ষ্য' (২।৭।৪২), অপরদিকে আবার শ্রীহরির বিলাস নিকেতন; সংসার একদিকে যেমন 'উগ্রব্যাল-নিষেবিত,' অপর দিকে তেমন 'সুরক্ষিত দুর্গ' (৫।১।১৮)। পরিমিত ভোগের সঙ্গে এই ভক্তিবাদের কোনও বিরোধ নাই, বিরোধ আসক্তির সঙ্গে। জঠরভরণের অতিরিক্ত ভোগ 'স্তেয় বা চৌর্য্য' (৭।১৪।৮), সুতরাং দণ্ডনীয়। ২।২।৪,৫ শ্লোক (২য় সং ২৩-২৪পৃঃ) ত্যাগ ও বৈরাগ্যের একটি চূড়ান্ত চিত্র। জাতি বয়স কুল মান পদ মত ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য এই ভক্তিবাদে সর্ব্বথা নিরাকৃত। ভক্তির ঘরে কে অধিকারী, আর কে অনধিকারী? কে ব্রাহ্মণ, কে 'স্ত্রী শূদ্র' (গীতা ৯।৩২ ইত্যাদি) আর কে 'শ্বপচ'?

ভক্তির যে আদর্শ শ্রীভাগবত ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। বিষয় চাহিলেও তিনি দেন না, বরং থাকিলে কাড়িয়া নেন, সে স্থলে দেন—সকল ইচ্ছার নিধান স্বীয় পাদপল্লব (৫।১৯।২৬) (২য় সং ৭৬পৃঃ)। ইন্দ্র বা ব্রহ্মার পদ, ত্রিলোকের আধিপত্য ত অতিতুচ্ছ, এমন যে বহুকীর্ত্তিত স্বর্গভোগ, তাহাও অতিশয় হেয়; মোক্ষ মুক্তি অপুনর্ভবও নিতান্ত ফল্গু (৫।১৪।৪৪)—'দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি' (৩।২৯।১৩)। ভক্ত চায় কেবল তাঁর পাদ-পল্লব, যে অন্য কিছু চায়, সে ত 'বণিক্' (৭।১০।৪)। গোপী-প্রেম এই অনিমিত্তা ভক্তিযজ্ঞে পূর্ণাহুতি।

বস্তুতঃ উপনিষদ ও ভাগবত উভয়েরই সাধন ভাগ একটা বিশুদ্ধ সবল ও সহজ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। মায়া মোহ শোক তাপ বাসনা কামনা হইতে যে নিদারুণ দুঃখবাদের উৎপত্তি, তাহা প্রাচীন উপনিষদসমূহে নাই। ঐ দুঃখবাদ ভাগবতপ্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের পথে কোথাও কোন জটিলতা আবল্য বা বিষাদক্লিষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রাচীন উপনিষদ ও ভাগবত এই উভয় শাস্ত্রেই ভক্তিলাভের অধিকারে, হৃদয়ভরা অ-তর্ক শ্রদ্ধা বা একান্ত নিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনও প্রকারের কোনও সর্ত্ত আরোপিত হয় নাই। উভয়ত্র এই পরম বাণীই উদাত্তস্বরে ঘোষিত হইয়াছে যে, সেই 'সর্ব্বান্নভুঃ' (বৃঃ ২।৫।১৯) 'আত্মপ্রদ' (৪।৩১।১২) শ্রীভগবান্ জলে স্থলে শূন্যে, তোমার হৃদয়-'দহরে' (ছাঃ ৮।১।১), আপনাকে অকাতরে বিলাইয়া দিয়াছেন—'দিবীব চক্ষুরাততং—চোখ খুলিলেই যেমন আকাশকে দেখিতে পাও। এই সুখদুঃখের নিত্যলীলাক্ষেত্রে—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে', 'রসিক ভাবুক' ভাবের চোখ খুলিয়া 'আ-লয়ং' (১।১।৩) সেই লীলারস পান করুন। সর্ব্বোপরি, কৃপা—'যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ' (২।৭।৪২)—'যমেবৈষ বৃণুতে'র (কঠ ২।২৩ ইত্যাদি) অবিকল প্রতিধ্বনি।

শ্রীভাগবত প্রেমের জয়-গীতি—

শ্রীভাগবত ভক্ত ও ভগবানের খেলা। এ খেলায় চিরদিনই ভক্তের জিত, ভগবানের হার, 'স্বভৃত্যৈর্জিতং পরাজিতম্' (১০।৮১।৪০)। প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর হাত দিয়া কত কষ্টই না দিলেন, তবু সে দমিল না।—শেষে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি ধরিয়া স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে আসিতে হইল। সেই বালকভক্তের কাছে এই তাঁর প্রথম পরাজয়। তার পর যখন বর দিতে চাহিলেন, ভক্ত তখন দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, এ তোমার কেমন কথা, আমি কি বণিক?—এই দ্বিতীয় পরাজয়। চতুর-চূড়ামণি তখন সৃষ্টিরক্ষার জন্য প্রেমের আহ্বান দ্বারা প্রহ্লাদকে পিতৃরাজ্যে স্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন।—ধ্রুব হারিয়াও জিতিলেন, রাজরাজেশ্বরের নিকট তুচ্ছ রাজত্বরূপ 'সতুষ তণ্ডুলকণা' লইয়া শেষে ধ্রুবলোক পাইলেন।—বৃত্রকে বধ করার জন্য অমোঘ কুলিশ গড়াইলেন, যুদ্ধকালে বৃত্রের প্রহারে ইন্দ্রের হাত হইতে সেই অস্ত্র খসিয়া পড়িল। বৃত্র ইন্দ্রকে বলিলেন, ঠাকুর আমার জন্য ঋষি-অস্থি-নির্ম্মিত এই অব্যর্থ যন্ত্র পাঠাইয়াছেন, আমি কিছুকাল অপেক্ষা করিতেছি, তুমি ইহা তুলিয়া লইয়া সত্বর আমার প্রতি নিক্ষেপ কর। ইন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া হার মানিলেন—বলিলেন, 'অসুর, তুমি কৃতকৃত্য, তুমিই ধন্য।'—বলি ঠাকুরের ছলনা ত সবই বুঝিলেন, তবুও সর্ব্বস্ব দিলেন—ক্রুদ্ধ গুরুর অভিশাপও তুচ্ছ করিলেন,

বারুণপাশে বদ্ধ হইয়া সুতলে তাড়িত হইলেন। ভক্তির যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া শেষে ঠাকুরকে গদাহস্তে সেই অসুরের 'দুর্গপালত্ব' অঙ্গীকার করিতে হইল।—অম্বরীষের যুদ্ধে ত অকুণ্ঠচিত্তে মানিয়া লইতে হইল 'আমি অস্বতন্ত্র ভক্তাধীন, সুতরাং হে দুর্ব্বাসা, তোমাকে রক্ষা করিতে অক্ষম।'—রন্তিদেবের সঙ্গে কি খেলাটাই না খেলিলেন, কত সাজে সাজিয়া আসিয়া তাহাকে হটাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, রন্তি কিছুতেই হটিলেন না, বলিলেন, ক্ষুৎপিপাসা ত তুচ্ছ কথা, জীবের সকল দুঃখ তুমি আমাকেই দেও, কত দুঃখ তোমার ভাণ্ডারে আছে আমি দেখিয়া লইব। শঠচূড়ামণি তখন ধরা দিতে বাধ্য হইলেন।

সর্ব্বশেষে, গোপের ঘরে আসিয়া 'ভরা ডুবাইলেন'—কি হারটাই না সেখানে হারিলেন। নন্দের 'বাধা' ত বহিলেনই, নারী-যুদ্ধে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হইতে হইল। প্রথমেই ত নাচার হইয়া মা যশোদার রজ্জুতে বান্ধা দিতে হইল। যজ্ঞপত্নীদের সঙ্গে জিতিয়া ভাবিলেন, এ অরণ্যচরী গোপকন্যারা আমার কি করিবে? তাদের কাছে প্রথম হারিলেন,—গৃহে পতিদের ও অরণ্যে হিংস্রজন্তুর ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে তাড়িত করার নিষ্ফল চেষ্টায়। তারপর হারিলেন, বস্ত্রহরণে তাদের সর্ব্বস্বসমর্পণে। রাসক্রীড়ায় আসিয়া দু দু বার জিতিবার চেষ্টা করিলেন, একবার, অভিমানিনীদের নিকট হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়া, আবার প্রেমদৃপ্তা গোপীকে পরিত্যাগের ভয় দেখাইয়া। সেই মুগ্ধা বন্যা ললনাগণ কিছুমাত্র হটিল না—কি এক দুর্দ্ধর্ষ প্রেমের যুদ্ধ তখন যমুনার তটভূমিতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল! অমন চিত্র কেহ কখনও আঁকিয়াছেন কিনা জানি না। বিধাতাপুরুষ কত কলঙ্ক তাঁর ললাটে লিখিয়াছিলেন, যাচিয়া আসিয়া আবার সেখানে ধরা দিতে হইল। বলিলেন, 'ন পারয়েঽহং' ইত্যাদি (১০।৩২।২২)। কত যাচ্ঞা, কত তোষামোদ করিয়া সেই প্রণয়িনীদের মন পাইতে হইল। বাঙ্গালীর আদি রসকবি এই খেলায় ভক্তের চূড়ান্ত জয়গীতি গাইয়াছেন—'দেহি পদপল্লবমুদারম্' ।—শ্রীভাগবত আদ্যন্ত এই প্রেমের জয় গীতি।

জয়তি জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম

॥ হরি ওঁ ॥

শ্রীগুণদা চরণ সেন

দ্বিতীয় সংস্করণ

এই সংস্করণে কিছু সংশোধন ও স্থানে স্থানে কোন শব্দের বা ভাষার সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র করা হইয়াছে।

দুইটি পরিশিষ্ট যোগ করিয়াছি। প্রথমটি একটি মানচিত্র, উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মানুষী কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয়টি দুইটি বংশতালিকা, উহাতে প্রধান প্রধান ঋষি ও রাজগণের পরস্পর বংশগত সম্বন্ধ বুঝা যাইবে। আশা করি এই দুইটি পরিশিষ্টই কুতূহলী পাঠকগণের মনে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করিবে।

এই উপলক্ষ্যে একটি কথা নিবেদন করি। কেবল কতকগুলি অবাস্তব ঘটনার উপর ভক্তির প্রতিষ্ঠা করা যেমন অসম্ভব, তেমন কোন প্রাচীন গ্রন্থে কতকগুলি অবাস্তব বা অবান্তর বর্ণনার উল্লেখ দেখিলেই ঐ গ্রন্থকে অকর্মণ্য বোধে একেবারে বর্জন করাও অসঙ্গত। জীবনের অন্যান্য সকল পথের ন্যায়ই ধর্ম্মের পথেও বাস্তব অবাস্তব উভয়েরই স্থান বা প্রয়োজন আছে। এক দিকে না ঝু কিয়া উভয়ের সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলাই সকল দেশের বর্ত্তমান যুগাচার্য্যগণের অনুশাসন। শ্রীভাগবতের পাঠেও আমাদের এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণে রাখা একান্ত আবশ্যক।

শ্রীভাগবতের কথা আর একবার বলিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলাম।

শ্রীগুণদাচরণ সেন